১৬০ স্লাইস সিটি স্ক্যান-এর

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ স্মারক

160 Slice CT Scan

ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতাল, ঢাকা

স্ট্রোকজনিত প্যারালাইসিসের পূনর্বাসন চিকিৎসা

কেস স্টাডি

০১. জনাব আলতাফ হোসেন উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। বিকেল বেলা হঠাৎ তার মুখ বেঁকে যায়। মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। পরে তার ডান হাত ও পা অবশ হয়ে যায়।

০২. ভালো মানুষটা রাতে ঘুমালেন, সকালে উঠে দেখি এক পাশের হাত-পা নাড়াতে পারছেন না। সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে স্ট্রোক আক্রান্ত রোগীর আত্মীয়ের রোগী সম্পর্কে বর্ণনা।

পৃথিবীতে প্রতি ছয় সেকেন্ডে একজন স্ট্রোকে মারা যায়। স্ট্রোকের ফলে মানুষ হারাচ্ছে কার্যক্ষমতা এবং ব্যয় হচ্ছে প্রচুর অর্থ। শুধুমাত্র ভুল চিকিৎসার কারণে স্ট্রোক আক্রান্ত রোগী হয়ে যাচ্ছে শারীরিক, মানসিক ও কর্মক্ষেত্রে অক্ষম। আমাদের দেশে প্রচলিত একটি ধারণা আছে, হার্টে বা হৃদপিণ্ডে স্ট্রোক হয়। আসলে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। স্ট্রোক একটি মস্তিষ্কের রক্তনালীর জটিলতাজনিত রোগ। আসুন, এবার জেনে নেয়া যাক স্ট্রোক কী, কেন হয় এবং স্ট্রোক রোগির ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির প্রয়োজনিয়তা সম্পর্কে।

স্ট্রোক কী

কোনো কারণে মস্তিষ্কের নিজস্ব রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে স্নায়ুকোষ নষ্ট হয়ে যাওয়াকে স্ট্রোক বলে। স্ট্রোককে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় সেরিব্রো-ভাসকুলার একসিডেন্ট বলা হয়। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, মস্তিষ্কের রক্তনালী দুর্ঘটনা। আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গা আমাদের শরীরের বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। তাই মস্তিষ্কের কোথায়, কতটুকু আক্রান্ত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে স্ট্রোকের ভয়াবহতা।

স্ট্রোকের কারণসমূহ

সাধারণত দু'টি কারণে স্ট্রোক হয়ে থাকে:

১. মস্তিষ্কের রক্তনালীতে কোন কিছু জমাট বাঁধলে: যার ফলে রক্তের নালিকা বন্ধ হয়ে যায় এবং মস্তিষ্কের আক্রান্ত স্নায়ুকোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

২. মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটলে: উচ্চ রক্তচাপ এই স্ট্রোকের অন্যতম কারণ যেখানে ছোট ছোট রক্তনালীকা ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ হয়, ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে চাপ বেড়ে যায় এবং অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো মারা যায়।

স্ট্রোকের প্রাথমিক উপসর্গসমূহ

স্ট্রোকের প্রাথমিক ৫টি উপসর্গ দেখা যায়:

১. হঠাৎ অতিরিক্ত মাথা ব্যথা

২. হঠাৎ মুখ, হাত ও পা অবশ হয়ে যাওয়া (সাধারণত শরীরের যে কোনো এক পাশ)। অনেক সময় মুখের মাংসপেশী অবশ হয়ে যায়, ফলে লালা ঝরতে থাকে।

৩. হঠাৎ কথা বলতে এবং বুঝতে সমস্যা হওয়া।

৪. হঠাৎ এক চোখ অথবা দুই চোখে দেখতে সমস্যা হওয়া।

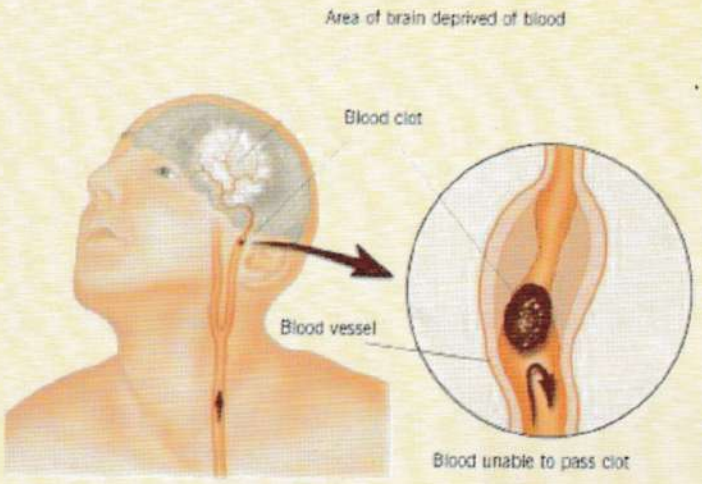

৫. হঠাৎ ব্যালেন্স বা সোজা হয়ে বসা ও দাঁড়াতে সমস্যা হওয়া, মাথা ঘুরানো এবং হাঁটতে সমস্যা হওয়া।

স্ট্রোক পরবর্তী সমস্যা

শরীরের এক পাশ অথবা অনেক সময় দুই পাশ অবশ হয়ে যায়, মাংসপেশীর টান প্রাথমিক পর্যায়ে কমে যায় এবং পরে আস্তে আস্তে টান বাড়তে থাকে, হাত ও পায়ে ব্যথা হতে পারে, হাত ও পায়ের নড়াচড়া সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কমে যেতে পারে, মাংসপেশী শুকিয়ে অথবা শক্ত হয়ে যেতে পারে, হাঁটাচলা, উঠাবসা, বিছানায় নড়াচড়া ইত্যাদি কমে যেতে পারে, যার ফলে চাপজনিত ঘা দেখা দিতে পারে, শোল্ডার বা ঘাড়ের জয়েন্ট সরে যেতে পারে ইত্যাদি।

স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়

বয়স সাধারণত ৫০ এর উপরে হলে, বংশে স্ট্রোক রোগী থাকলে, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে, উচ্চ কোলস্টেরল লেভেল থাকলে, ধূমপায়ী হলে, ডায়াবেটিস থাকলে, ইতোপূর্বে একবার স্ট্রোট করলে, এলকোহলিক হলে, রক্তের নালীকাতে কোনো সমস্যা থাকলে।

স্ট্রোক প্রতিরোধের উপায়

উচ্চ রক্তচাপে সম্পর্কে জানা, রক্তনালীর কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করা, ধূমপান বন্ধ করা, কোলস্টেরল, সোডিয়াম এবং ফ্যাটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা, চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাবার (যেমনঃ ফাস্টফুড, মাখন, ঘি, মিষ্টি, পোলাও, গরু-খাশির গোসত, চিংড়ি, ডিমের কুসুম ইত্যাদি) কম খাওয়া, অ্যালকোহল সেবন থেকে বিরত থাকা, ডায়াবেটিসের সঠিক চিকিৎসা করা, নিয়মিত ৪৫ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করা, অতিরিক্ত ঔষধ সেবন না করা।

চিকিৎসা পদ্ধতি

ঔষধ স্ট্রোক রোগীকে মেডিকেল স্ট্যাবল করতে পারলেও তার শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে না। স্ট্রোক পরবর্তী সমস্যাগুলো দূর করে শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা। তাই রোগী স্ট্রোক আক্রান্ত হলে দ্রুত সম্ভব রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাবেন এবং ২৪ ঘন্টার ভেতরে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা শুরু নিশ্চিত করবেন। মনে রাখবেন, স্ট্রোকের পর যত দ্রুত ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা শুরু করা যাবে, রোগীর কার্যক্ষমতা ফিরে আসার সম্ভাবনা তত বেশি থাকে। ফিজিওথেরাপি দৈনিক ৩/৪ বার করে দিতে হতে পারে। বাসায় ১ বার করে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিয়ে তেমন কোনো ফল আসে না। তার জন্য রোগীকে ক্লিনিক বা হাসপাতালে ভর্তি রেখে ফিজিওথেরাপি চালিয়ে যাওয়াই উত্তম। শুরু থেকে ফিজিওথেরাপি চালু থাকলে ২/৩ মাসে রোগী আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক রোগীর শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে একিউট ও ক্রনিক স্টেজ এভাবে দুই রকম চিকিৎসা প্রয়োজন হয় এবং প্রতি মুহূর্তেই রোগীর ফিজিক্যাল অবস্থা অবজার্ভ করতে হয়। ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমনঃ মবিলাইজেশন এক্সারসাইজ, স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, রেইনজ অব মোশন এক্সারসাইজ, পশ্চারাল ইনহেবিলিটেশন এক্সার সাইজ, ভেজোমোটর রিফ্লেক্স এক্সার সাইজ, রিলাক্সেশন এক্সারসাইজ, একটিভ ফ্রি, একটিভ এসিসটেড, এসিসটেড রেজিসটেড, রেজিসটেড এক্সারসাইজ, রিএজুকেশন এক্সারসাইজ, ব্যালেন্স ট্রেনিং, গেইট ট্রেনিং, পিএনএফ এবং বোবাথ-কেবাথ এক্সারসাইজ, নিউরোমাসকুলার এক্সাইটেশন ও ইনহেবিলিটেশন, মাসকুলার স্ট্রেচিং, বিভিন্ন অর্থোসিস বা প্রসথেসিস ট্রেনিং ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পুনর্বাসন চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী ধীরে ধীরে কর্মক্ষম ও সুস্থ হয়ে উঠে, অনেক ক্ষেত্রে ইলেকট্রোথেরাপির প্রয়োজন হতে হবে। তাই ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা যেখানে সেখানে বা কোনো টেকনোলজিস্ট বা টেকনিশিয়ানের দ্বারা না নিয়ে ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে নিতে হবে। তাহলে রোগী অবশ্যই ভুল চিকিৎসা থেকে বেঁচে যাবেন এবং একটি স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবন ফিরে পাবেন। আর যারা দীর্ঘদিন প্যারালাইসিসে আক্রান্ত তাদের শারীরিক পুনর্বাসনের পাশাপাশি মানসিক পুনর্বাসনও করতে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেয়া।

ডাঃ মোঃ সফিউল্যাহ্ প্রধান
চেয়ারম্যান ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ
ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি এন্ড
রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (ডিপিআরসি)
২৯, প্রবাল হাউজিং, রিং রোড, ঢাকা